নীহারকণা মারা গেলেন

ডক্টর রমা দত্ত চোখ খুলে মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়িটা একেবারে নাকের কাছে ধরলেন। চশমা ছাড়া কাছের জিনিষ ভাল ঠাহর পান না ইদানীং, দূরের জিনিষ তো নয়ই। চোখ কুঁচকে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলেন। আজ রাতে আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে। এমনিতেও রাত আর বেশী বাকী নেই। এপাশ ওপাশ করে আর খানিক বাদে বাদে ঘড়ি দেখেই কেটেছে এতক্ষণ। বাকী রাতটুকুও এই ভাবেই কাটাতে হবে। আলো জ্বেলে ঘুমোতে পারেন না রমা দত্ত। কিন্তু বাড়িতে মড়া থাকলে নাকি আলো জ্বেলে রাখাই নিয়ম। নীহারকণার ঝি সুমতি বলেছে।

সুমতিই সন্ধ্যে হতে না হতে পট্‌পট্‌ করে সুইচ টিপে সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে - উঠোন, বারান্দা, কলঘর, রান্নাঘর, এমনকি ঘুঁটে কয়লা রাখার চালাঘরটায়ও। এর উপর আবার পিদিম জ্বালিয়ে দিয়েছে নীহারকণার ঘরে, একটা লন্ঠনও রেখেছে বারান্দায় - যদি লোডশেডিং হয় সেই আশঙ্কায়। লোডশেডিং হলে হয়তো একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতেন রমা দত্ত, কিন্তু লোডশেডিং হয়নি। ঘরের জোরালো আলোটা কট্‌মট্‌ চোখে চেয়ে থেকেছে তাঁর দিকে, ঠিক নীহারকণার মত। হ্যাঁ, নীহারকণা দু'চোখ লাল করে কট্‌মট্‌ করেই তাকিয়েছিলেন রমা দত্তর দিকে, শেষ বারের মত চোখ বোঁজার কিছুক্ষণ আগেও। অথচ এই ভাবে যে ব্যাপারটা ঘটবে, শেষ বিদায়ের ক্ষণে তাঁর প্রতি এতখানি তিক্ততা উদগার করবেন নীহারকণা, তা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কখনো ভাবেনি রমা দত্ত।

নীহারকণার চিঠি পেয়েই এখানে এসেছিলেন তিনি, বহু অসুবিধা স্বীকার করে। আগামী সপ্তাহে ম্যানিলায় সেমিনারে যোগ দেবার আগে ইন্‌ষ্টিটিউটে অনেক কিছু সামাল দিতে হবে তাঁকে। ইতিমধ্যে নীহারকণার দ্বিতীয় চিঠিখানা পেলেন। এবার আর নিজে হাতে লিখতে পারেননি,

স্কুলের কোন সহকর্মী লিখে দিয়েছে। চিঠিখানা পেয়ে রমা দত্ত আর স্থির থাকতে পারেননি। প্রথম ট্রেনেই চলে এসেছেন দিল্লী থেকে বিহারের এই গণ্ডগ্রাম অঞ্চলে। নীহারকণা তখন চেতনা-অচেতনার মাঝে ভাসছেন। শেষ রাতের নিভন্ত প্রদীপের মত প্রাণপাখী দেহের প্রান্তে এসে থমকে থেমে আছে। উড়ে যাবার আগের মুহূর্তে দম নিচ্ছে যেন। সুমতি রমা দত্তকে নীহারকণার ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর শিয়রে চেয়ার টেনে বসতে দিল। আশেপাশের কোয়ার্টার থেকে দু'চারজন শিক্ষিকা নিঃশব্দ পদচারণে এসে ঘুরে গেলেন কয়েক বার। তাঁদের কেউ রমা দত্তের জন্যে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন। সুমতিকে আড়ালে ডেকে নীচু গলায় রাতের আহার্যের ব্যবস্থা জানিয়ে গেলেন।

ডাক্তার সকালে দেখে গেছেন। তাঁর করণীয় আর কিছু নেই। সুদীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও রমা দত্ত নীহারকণার শিয়রে ঠায় বসে রইলেন। এতবছর পরে, এতদূর থেকে এসেও কোন কথা হবে না, এমন কি নীহারকণা তাঁর আসার সংবাদটুকু পর্যন্ত পাবেন না একথা ভাবতে বুক ফেটে যাচ্ছিল রমা দত্তের। বুঝি এমনই হয়। এত বছর ইচ্ছে করলে যখন খুশি আসতে পারতেন কিন্তু কোনদিন আসেননি, সে ইচ্ছেই হয়নি তাঁর। আর আজ যখন তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছে সময়, তখন অনুশোচনায় মাথা কুটে মরছেন। কিন্তু দোষ কি তাঁর একার? নীহারকণাও তো কই এর আগে কখনও ডাকেননি। প্রথম চিঠিখানা পেয়েছিলেন মাসখানেক আগে। নীহারকণা অসুস্থ, বহুদিন যাবৎ লিভারের গোলযোগে ভুগছেন এবং উপস্থিত শয্যাশায়ী, রমা দত্তকে একবার দেখার জন্য মন তাঁর বড়ই ব্যাকুল - এ চিঠিখানা পাবার আগে প্রায় দুই দশক যাবৎ চিঠিপত্রের একেবারেই আদান প্রদান হয়নি তাঁদের। দুই দশেক কেন, তারও বেশী।

ক্যানাডা থেকে ফিরে তখন নতুন চাকরীতে ঢুকেছেন রমা দত্ত। মামার মৃত্যু সংবাদ ক্যানাডায় থাকতেই পেয়েছিলেন। মামা শেষ অবধি নীহারকণার বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। অথচ আই.এ. পাশ করার পর কিছুতেই মেয়েকে পড়তে দিলেন না।

বললেন, "মেয়েছেলের অত পড়াশুনো করে বিদ্যেদিগ্‌গজ হয়ে কাজ নেই। সেই তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাড়ি ঠেলা কপালে রয়েছে চিরদিন। তার জন্যে আর অত লেখাপড়া শিখতে হবে না।"

রমা দত্তেরও পড়াশোনায় ইতি পড়তো সেবারই, নেহাত নীহারকণার চেয়ে বয়সে পাঁচমাসের ছোট বলে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

মামীমা বললেন, "দুটো মেয়েকে কি আর একসঙ্গে পার করতে পারবে? আগেভাগে পড়া বন্ধ করে ঘরে বসিয়ে লাভ কি? রমা বরং তদ্দিন পড়ুক, নীহারের বিয়েটা হয়ে গেলেই ওকে কলেজ ছাড়িয়ে নিও।"

এই একটা কারণেই অন্তত মামীমার কাছে চিরঋণী রমা দত্ত। মামীমা সেদিন মামাকে ঐ পরামর্শটুকু না দিলে মামা হয়তো অচিরে তাঁকেও পার করতে তৎপর হতেন এবং হয়তো তাঁর সে চেষ্টা সফল হত রমা দত্তের বেলায়। কারণ রমা দত্ত নীহারকণার চেয়ে দেখতে শুনতে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন।

কিন্তু নীহারকণার ময়লা রঙ ও সাদামাটা চেহারার আড়ালে এক প্রখর প্রতিভা লুকিয়ে ছিল। রমা দত্ত নিজেও মেধাবী ছাত্রী ছিলেন বরাবর, কিন্তু ওঁর সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁর। কোন পরীক্ষাতে ফার্স্ট বই সেকেণ্ড হননি নীহারকণা। ম্যাট্রিক ও আই.এ.'তে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। স্কলারশিপও। কিন্তু তবু মামা আর পড়তে দিলেন না। বললেন হেঁসেল ঠেলার জন্যে লেখাপড়া লাগে না। রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়াই ঘরের কাজ শিখুক। মেয়েমানুষের যা কাজ। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা চরিত্তির কিছু কম করেননি মামা, কিন্তু নীহারকণার বিয়ের ফুল আর ফুটলো না। এদিকে রমা দত্ত বি.এ. পাশ করলেন, এম.এ. পাশ করলেন এবং এরপর হঠাৎ একদিন বাড়ির সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন। মামীমা অনেক কাঁদাকাটি করলেন, মামা শাসালেন জীবনে কখনো মুখদর্শন করবেন না বলে। কিন্তু রমা দত্ত তখন ওদের নাগালের বাইরে।

ক্যানাডা থাকতে খবর পেয়েছিলেন যে মামা গত হয়েছেন। খবরটা পেয়েছিলেন অন্য কারও চিঠিতে। মামাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না আর। কুমারী অরক্ষণীয়া মেয়ের তথাকথিত দুঃসাহসিকতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি রমা দত্তের মামাবাড়ির লোকেরা। কোন শৈশবে বাপ-মা'হারা অবস্থায় সে-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন রমা দত্ত। নিজের বাড়ি, নিজের বাবা-মা'র কোন স্মৃতি মনে নেই তাঁর। মামা মামী আর মামাতো ভাইবোনেরাই তাঁর সব কিছু ছিল এ যাবৎ ! বিশেষ করে নীহারকণা।

আশৈশবের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা দু'জনের। তাঁর জন্যেই সব থেকে খারাপ লাগতো রমা দত্তের। ওঁরা চিঠিপত্র না দিলেও উনি খোঁজ-খবর রেখেছেন বরাবর এর ওর তার মারফৎ।

ক্যানাডা থেকে ফিরে এসে শুনলেন নীহারকণা তখনও বিয়ের প্রত্যাশায় ঘরে বসে দিন গুণছেন আর মামীমা হন্যে হয়ে ঘটকদের দোরে ঘোরাঘুরি করছেন এবং কাগজে কাগজে এন্‌তার বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। রমা দত্ত আর স্থির থাকতে পারেননি। নীহারকণার মত সম্ভাবনাময় প্রতিভা এভাবে অবহেলায় অবমাননায় ফুরিয়ে যাচ্ছে এ তাঁর সহ্য হয়নি। তাঁকে আবার নতুন করে পড়াশোনা আরম্ভ করতে অনুনয় করে এবং তাঁর পড়াশোনার সব ভার সাগ্রহে বহন করার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এবং নীহারকণা যে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল, প্রতিষ্ঠাবান ভবিষ্যতের অধিকারিণী হবেন তাঁর এ ধ্রুব বিশ্বাসও মুক্ত বচনে জানিয়েছিলেন চিঠিতে। নীহারকণা সে চিঠির জবাব দেননি। জবাব দিয়েছিলেন মামীমা। পোষ্টকার্ডে সংক্ষিপ্ত দু'লাইনে তীব্র কষাঘাত হেনেছিলেন। সে চিঠির ভাষা এখনও পরিষ্কার মনে আছে তাঁর, "তুমি নিজে গোল্লায় গিয়াছ, আমার মেয়ের মাথাটি খাইওনা ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। তোমাকে কন্যাস্নেহে পালন করিয়াছিলাম তাহার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছ। অনুগ্রহ করিয়া নীহারকণার সর্বনাশ করিও না ----।"

এরপর আর ওঁদের কোনও খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করেননি রমা দত্ত। তবু আত্মীয়-পরিজন চেনা-পরিচিতের কাছে মাঝে মাঝে শুনেছেন কিছু না কিছু। মামীমা গত হয়েছেন আজ বছর দশেক। নীহারকণার ছোট ভাই রতন বিয়ে করেছে, ভাল চাকরি-বাকরি করছে। বদলির চাকরি। বম্বে, মাদ্রাজ, হিল্লী-দিল্লী করে বেড়ায়। নীহারকণা বিহারেই ছোট মতন একটা মেয়ে ইস্কুলে সেলাই শেখান। সামান্য মাইনে। কোন মতে দিন চলে যায় তাঁর। এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। রতনের বউ নাকি ভারি আপটুডেট ফ্যাশানশীল ছিমছাম মহিলা। আইবুড়ো সেকেলে ননদের দায়িত্ব নিতে একেবারেই নারাজ। রতন ও বিশেষ গা করেনি। বিহারে এই গণ্ডগ্রামেই তাই ঘর বেঁধেছেন নীহারকণা। ছোট দু'টো খুপরি ঘর, এক চিলতে বারান্দা। উঠোনের এক পাশে টিনের শেড'এ কলঘর ও পায়খানা। বারান্দার খানিকটা ঘিরে নিয়ে এক টুকরো রান্নাঘর। সুদীর্ঘ দশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন নীহারকণা এখানে। জীবনের শেষ লগ্নটুকুও

এখানেই বাঁধা ছিল তাঁর।

রমা দত্ত আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে চারটে। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। একটু জল পেলে হত। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে সুমতি ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে জল চাইতে সঙ্কোচ হল রমা দত্তের। গত ক' রাত নিশ্চয়ই ভাল করে ঘুমোতে পারেনি মেয়েটা, তাই অমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রমা দত্ত চোখ বুঁজে আবার স্মৃতিচারণে মন দিলেন। হ্যাঁ, নীহারকণার জন্যে মনে মনে এত বছর গভীর মমতাভরা বেদনাই অনুভব করে এসেছিলেন তিনি। ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে তাঁর সম্বন্ধে মমতা নয় বেদনা নয় একটা কুৎসিত ধারণা নিয়ে রয়েছেন নীহারকণা। গতকাল নীহারকণার শিয়রে বসে অস্থিচর্মসার নিঃসাড় দেহটার দিকে চেয়ে বারে বারে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল আর বারে বারে রুমাল দিয়ে চশমা জোড়া মুছছিলেন রমা দত্ত। মনে মনে ভাবছিলেন, "আহা এতদূরে ছুটে এলাম, ওর সঙ্গে কথা বলা হল না। ও জানতেও পোলো না আমি এসেছিলাম ----।" সত্যিই যদি তাই হত, নীহারকণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ যদি না আসতো তবে নীহারকণা সম্বন্ধে তাঁর মানসপটে যে স্নেহময় ছবিখানা সযত্নে বাঁধানো ছিল তা এভাবে ভেঙে খান খান হয়ে যেতো না।

কতক্ষণই বা জ্ঞান হয়েছিল নীহারকণার? মিনিট পনেরো-কুড়ি, কি বড় জোর আধ ঘন্টা। রমা দত্ত সবে চায়ের গ্লাসটা শেষ করে পাশে নামিয়ে রেখেছেন। চা, আর ডিশে করে কুচো নিমকি পাঠিয়েছিলেন পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা। নীহারকণার সহকর্মিণী। কুচো নিমকির ডিশ হাতে নেননি রমা দত্ত। মাথা নেড়ে শুধু চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়েছিলেন। খানিক বাদে ভদ্রমহিলা নিজেই এলেন। নীচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন রমা দত্তের সঙ্গে। ডাক্তার নাকি তিন দিন আগেই নোটিস দিয়ে গেছে। নীহারকণা যে এখন অবধি টিকে আছেন সেটাই আশ্চর্য। তবে আজকের রাতটা কাটবে না মনে হয়।

ভদ্রমহিলা আরও বললেন যে নীহারকণার ভাই রতনকে নাকি টেলিগ্রাম করা হয়েছে আজ সকালে। নীহারকণাই নাকি তার ঠিকানা আর টেলিগ্রাম করার জন্যে টাকা দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে উনি মারা গেলে অমুক ঠিকানায় খবর দিতে। তবে খবরটা যেন মারা যাবার পর

যায় পই পই করে বলে দিয়েছিলেন তা। কিন্তু এঁরা আগেই তার পাঠিয়েছেন। মানুষটা অত দূর থেকে আসবে তাতেও তো দেড় দু'দিন লাগবে। স্বামী পুত্রের অবর্তমানে ভাই-ই মুখাগ্নির অধিকারী। সময়মত এসে না পৌঁছলে মড়া আগলে বসে থাকতে হবে। অবশ্য তাতে কিছু না। নীহারকণা এত বছর এঁদের সঙ্গে ছিলেন, একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বৈকি। পাশাপাশি থাকা খাওয়া কাজকর্ম, বিদেশে এঁরাই পরমাত্মীয় হয়ে গেছেন। আজ মানুষটা এঁদের মাঝে মারা গেলে প্রয়োজন হলে শেষ কাজটুকুও এঁরাই করবেন। কিন্তু ভাই যখন আছে তখন বিধিমত চলাই বিধেয়। আত্মার সদগতির প্রশ্ন যেখানে ----।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে নীচু গলায় এমন সময় নীহারকণা চোখ মেলে চাইলেন।

নিস্তেজ অথচ বেশ স্পষ্ট গলায় বললেন, "কে ওখানে?"

সহকর্মী মহিলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সুমতি ছুটে এলো। নীহারকণা আঙুল দিয়ে রমা দত্তের দিকে ইশারা করলেন।

রমা দত্ত বললেন, "আমি রমা। তুমি আসতে লিখেছিলে।"

নীহারকণা সুমতিকে বললেন, "তোরা একটু বাইরে যা। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।"

পাশের বাড়ির মহিলাকে নিয়ে সুমতি বেরিয়ে গেল। রমা দত্ত চেয়ারটা নীহারকণার বিছানার সঙ্গে সাঁটিয়ে ওঁর খুব কাছে এসে বসলেন।

বললেন, "কেমন আছ নীহার?"

ওঁর বুকে অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছিল, চশমার কাঁচ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল।

নীহারকণা বললেন, "তুই কেমন আছিস? তোর সব খবর রাখি। অনেক বড় হয়েছিস। কাগজে নাম ছাপে। ছবি বেরোয়। হট্ হট্ করে দেশ-বিদেশে লেকচার সেমিনার করে বেড়াস ----।"

নীহারকণা থামলেন। ওঁর বুক দ্রুত ওঠা নামা করতে লাগলো। বোধ হয় এতগুলো কথা একসঙ্গে বলার পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে। রমা দত্ত আলতো করে নীহারকণার পিঠে হাত রাখলেন। কি যে বলবেন ভেবে

পেলেন না। ওঁর মনের ভিতর তখন না বলা কথারা তোলপাড় করছে, যেন হঠাৎ আগুন লাগা বদ্ধ সিনেমা হল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বিত্রস্ত জনতা। বেরোতে পারছে না, শুধু সেই প্রচেষ্টায় আহত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সকলে।

নীহারকণা একটু থেমে দম নিয়ে আবার বললেন, "অনেক বড় হয়েছিস মানলাম, কিন্তু কতখানি মূল্য দিয়ে, কতখানি ক্ষতি স্বীকার বল্ দিকি? কি লাভ হল?"

রমা দত্ত অবাক হয়ে বললেন, "ক্ষতি? লাভ? কি বলছিস নীহার? বুঝতে পারছি না।"

নীহারকণা বললেন, "বুঝতে ঠিকই পেরেছিস্। এই যে এত বছর একা একা ঘুরলি, তোর কোনও ক্ষতি হয়নি এতে?"

"ক্ষতি কেন হতে যাবে? নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। এত সম্মান এত প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, একে ক্ষতি বলিস তুই? আজ আমি কারও তোয়াক্কা করি না। মেয়ে বলে, দেখতে সুন্দর নই বলে, রঙ ফর্সা নয় বলে কেউ হেলা-তুচ্ছ করে না। দেশের একটা সেরা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আমি, আমার সাবজেক্টে স্বনামধন্যা বিশেষজ্ঞ। আমার লেখা শুধু এ দেশে নয় সারা বিশ্বের নামী নামী পত্রিকায় ছাপা হয়। ডজন ডজন ছাত্র ছাত্রী আমার কাছে কাজ করে বড় বড় ডিগ্রী পেয়েছে ----।"

নীহারকণা বললেন, "সে সব জানি। কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়নি তোকে? মেয়েদের জীবনে এই কি সব?"

রমা দত্ত নাক কুঁচকে বললেন, "তুই বিয়ের কথা বলছিস? বিয়ের কথা আসছে কোত্থেকে? বিয়ে একটা ঘটনা। আমার জীবনে সেটা ঘটেনি। আর আমি যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না পড়তাম তবেই যে বিয়ে হত কে বলেছে? আমাকে যে পাত্রপক্ষের পছন্দ হত, তাদের খাঁই মামা যে মেটাতে পারতেন এবং বিয়ে হলেও যে আমার কপালে ভাল ঘর-বর-শাশুড়ি-ননদ জুটতো তা কে বলতে পারে? তুই তো বিয়ের আশায় ঘরে বসে রইলি, কিছু লাভ হল?"

নীহারকণার দু'চোখ জ্বলে উঠলো, "অন্তত তোর মত সব কিছু জলাঞ্জলি দিইনি।"

"তার মানে? কি বলছিস্ বারে বারে? আমার কি ক্ষতি হয়েছে, কি

জলাঞ্জলি গেছে বলবি তো?"

নীহারকণা উত্তেজিত গলায় বললেন, "এই আমাকে ছুঁয়ে বল দেখি, তিন সত্যি করে বলতে পারবি যে তুই আজও কুমারী আছিস? নিজের দেহ নোংরা করিস্‌নি?"

রমা দত্ত বিহ্বল হতবুদ্ধি হয়ে অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। মুখে কথা জোগালো না তাঁর।

নীহারকণা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি জানি। বেলেল্লাপনা করে বেড়িয়েছিস্‌ সারা জীবন। লজ্জা ঘেন্নার বালাই নেই। আমি? আমিও পারতাম। ম্যাট্রিকে স্ট্যাণ্ড করেছিলাম। আই.এ.'তেও। তোর থেকে ঢের বেশী বড় হতে পারতাম, বুঝলি? দেশজোড়া খ্যাতি, বিদেশের কাগজে লেখা ছাপানো আমারও হত। প্লেনে করে হুট্‌ হাট্‌ সেমিনার করতাম, এখানে ওখানে লেকচার দিয়ে বেড়াতাম। সবাই ধন্যি ধন্যি করতো। কিন্তু আমি তা হইনি। আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বুঝলি? আমার প্রবৃত্তি হয়নি।"

নীহারকণা চোখ বুঁজে হাঁপাতে লাগলেন। ওঁর বুকটা হাঁপরের মত ওঠানামা করতে লাগলো।

সুমতি ছুটে এলো, "দিদিমণি ! দিদিমণি !"

নীহারকণা সাড়া দিলেন না।

সুমতি রমা দত্তকে বললো, "আপনি ও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। ট্রেনে এসেছেন। দিদিমণির আর বোধহয় জ্ঞান হবে না। আজ তিন দিন পরে কথা বললেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই বোধ হয় প্রাণটাকে ধরে রেখেছিলেন। এইবার চলে যাবেন।"

সুমতির কথাই সত্যি হল। নীহারকণা চেতনার সোপান দিয়ে নীচে নামতে নামতে এক সময় একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন।

পাশাপাশি ছোট ছোট দু'খানা ঘর। ও ঘরে নীহারকণা শুয়ে আছেন। শাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে। রতন এসে পড়লে কাল সকালেই দাহ করা হবে। তা নইলে বিকেলের ট্রেন দেখে তারপর স্থানীয় লোকেরাই শেষকৃত্য সমাপন করবেন। রমা দত্তের ট্রেনও কাল সকালেই। রিটার্ন টিকিট আছে। ইচ্ছা থাকলেও দেরী করতে পারেন না উনি।

ইন্‌ষ্টিটিউটে গাদাও কাজ পড়ে আছে। ম্যানিলা যাবার আগে সব গোছগাছ করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেতে হবে।

বড় তেষ্টা পাচ্ছে। রমা দত্ত হাত বাড়িয়ে চশমার খাপটা হাতে নিয়ে চশমা বার করে পরলেন। ব্যাকুল চোখে ঘরের চারিদিকে আঁতিপাঁতি করে তাকালেন। নাঃ, এ ঘরে জল নেই। সম্ভবত পাশের ঘরে আছে, নিদেনপক্ষে রান্নাঘরে। রমা দত্ত সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালেন। এক গ্লাস জলের জন্যে আর একজনের ঘুম নষ্ট করার কোন মানে হয় না। গৃহস্থের বাড়ি খাবার জলের সংস্থান থাকবেই এবং উনি নিজেই খুঁজে বার করতে পারবেন তা। নিঃশব্দে পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালেন রমা দত্ত। পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরোলেন। রান্নাঘরের শিকল নামিয়ে দরজা খুললেন। খড়ের বিড়ের উপর জলের মটকা রাখা। একটা নয়, দুটো। মাটির খুরি দিয়ে ঢাকা। বাসনের পাঁজা থেকে কাঁসার গ্লাস নিয়ে জল ঢাললেন। সেই জলে গ্লাসটা ধুয়ে আবার জল ঢাললেন গ্লাস ভরে। ঢক ঢক করে দু'গ্লাস জল খাবার পর যেন তেষ্টা মিটলো এতক্ষণে। দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বারান্দা পার হয়ে নিজের বিছানায় ফেরার মুখে নীহারকণার ঘরে এসে হঠাৎ থেমে গেলেন রমা দত্ত।

কয়েক ঘন্টা আগে নীহারকণার তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত কন্ঠে বলা কথাগুলো মনে এলো। আশ্চর্য, ওঁর সম্বন্ধে এই রকম অদ্ভুত একটা ধারণা বুকে নিয়ে মারা গেলেন নীহারকণা ! রমা দত্ত আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলেন। আটচল্লিশ। হ্যাঁ, আটচল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে তাঁর। নীহারকণার থেকে মাত্র পাঁচ মাসের ছোট তিনি। রমা দত্ত নীহারকণার মুখের থেকে চাদর সরিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। সাড়ে আটচল্লিশ বছর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুড়ি লাগে নীহারকণাকে। দীর্ঘদিনের রোগ, মানসিক দ্বন্দ, অভাব অনটান - কে জানে কি কারণে ! বন্ধ দু'চোখের তলায় গভীর খাদ, মাথায় জায়গায় জায়গায় অল্প টাক, ভুরু দুটো অনেক পাতলা হয়ে গেছে। রমা দত্তের মনটা হু হু করে উঠলো।

মনে মনে বললেন, "নীহার, তুই যদি সত্যি ভেবে থাকিস্‌ জীবনের কাছে তুই ঠকিস্‌নি, তবে তাই হোক। তোকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম রে, নতুন জীবন দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই বেরিয়ে আসতে পারলি না। ওরা তোকে আটকে ফেললো। আজ যাবার আগে যদি আমাকে ঘৃণা করে এতটুকু শান্তি, এতটুকু তৃপ্তি পেয়ে থাকিস তবে তোর ভুল ভেঙে

দিয়ে আমি তোর সেটুকু আনন্দ কেড়ে নিতে চাই না রে।"